শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার চিন্তার পুনর্পাঠ

রশীদ আল ঘান্নুশী

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে বর্তমানে আগ্রহী কোনো কর্মী, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক বা অন্য যে কারো কাছেই ইবনে তাইমিয়া একটি পরিচিত নাম। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধু নাম ও কিছু অস্পষ্ট পূর্বানুমান ছাড়া তাঁর সম্পর্কে লোকজনের তেমন জানাশোনা নেই। মৃত্যুর আট শতাধিক বছর পরেও যাকে নিয়ে বিতর্ক চলছে, কে সেই ইবনে তাইমিয়া?

হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী একটি সম্মানিত পরিবারে আহমদ তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার জন্ম। ৬৬১ হিজরীর (১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) ১০ রবিউল আউয়াল তারিখে বর্তমান সিরিয়া ও তুরস্কের মাঝামাঝি অবস্থিত হার্রানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানেই বেড়ে ওঠেন। তারপর মোঙ্গলদের আক্রমণের ফলে পুরো অঞ্চলে ত্রাস ও ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে পড়লে তাঁর পরিবার রাতের আঁধারে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। সাথে করে নিয়ে যায় যে কোনো আলেম পরিবারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বই।

হার্রান ছেড়ে দামেস্কের উদ্দেশ্যে এই ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা অল্পবয়সী ইবনে তাইমিয়ার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এর ফলে তাতার দখলদারদের প্রতি তাঁর মনে ধীরে ধীরে তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়। পরবর্তীতে তাঁর কলম, জবান ও তরবারী দিয়ে তাতারদের বিরোধিতায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করায় তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাঁর দৃষ্টিতে বিদআত ও ভ্রান্ত আকীদার ফলেই উম্মাহর কার্যকারিতা, জিহাদ ও ইজতিহাদের চেতনা বিনষ্ট হয়েছে। এসব থেকে উম্মাহকে মুক্ত করার মাধ্যমে তাতারদের প্রতিরোধ করার জন্যে তিনি শাসক ও জনগণকে আহ্বান করেন।

দামেস্কে পৌঁছার পরপরই ইবনে তাইমিয়ার পিতা শাইখ শিহাব উদ্দীন শহরের সমঝদার জ্ঞানী মহলে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। উমাইয়া মসজিদে দলে দলে লোকজন তাঁর দার্সে অংশগ্রহণ করতো। তিনি দারুল হাদীস আল-শুক্কারিয়্যাহ্র শাইখ হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর পুত্র এই পরিবেশেই বেড়ে ওঠেন।

তাকিউদ্দীন অল্প বয়সেই কোরআন হিফজ করেন। কোরআনের পাশাপাশি তিনি তাঁর বাবার কাছে হাদীস ও ফিকাহ্র পাঠ নেন। এছাড়া অন্যান্য আলেমের অধীনে ভাষাবিজ্ঞান, উসূল এবং দ্বীনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করেন। তরুণ ইবনে তাইমিয়া শুধু পরিবার থেকে প্রাপ্ত বিষয়সমূহের শিক্ষায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং তিনি গভীরভাবে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, গণিত, বীজগণিত, এবং ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি দ্রুত মুখস্ত করতে পারতেন এবং খুব কমই ভুলতেন।

বিশ বছর বয়সের পূর্বেই তিনি ফতোয়া দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দারুল হাদীস আল-শুক্কারিয়ায় হাদীস ও ফিকেহর শিক্ষক হিসেবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল একুশ বছর। উমাইয়া মসজিদেও তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। সেখানে তিনি তাফসীরের ওপর দার্স দিতেন। ১২৯৬ সালে তাঁর শিক্ষক ও মাদ্রাসা আল-হাম্বলিয়ার ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যাপক যাইনুদ্দীন ইবনে মুনাজ্জা মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে তাইমিয়া পরবর্তীতে সে পদে যোগদান করেন।

ইবনে তাইমিয়া উপলব্ধি করেন তাওহীদ হচ্ছে ইসলামের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ফলে হেলেনীয় দর্শন, অজ্ঞেয়বাদ, অবান্তর ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক এবং দার্শনিক মরমিবাদ থেকে ইসলামী চিন্তা ও আকীদাকে মুক্ত করতে তিনি জীবনের বিরাট অংশ ব্যয় করেন। ইসলামী

সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই এই বিষয়গুলো গভীরভাবে গেড়ে বসেছিল। বিশেষ করে মানুষের ধারণা, বিশ্বজগতে তার অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত ধারণাগুলো ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ (সর্বেশ্বরবাদী অদ্বৈতবাদ – এতে মনে করা হয় – সবকিছু একই সত্তার নির্যাস) ও ‘হুলুল’ (অবতারবাদ) সংক্রান্ত আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইবনে তাইমিয়া এ সমস্ত আকীদার ব্যাপারে শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। এগুলো বিভাজন, সংশয়, কঠোরতা এবং নিষ্ক্রিয়তা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এগুলো উম্মাহ্র ভিত্তিমূলে আঘাত করার মাধ্যমে এর গতিশীলতাকে স্তব্ধ করে দিচ্ছিলো এবং উম্মাহ যে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন সেগুলোর ব্যাপারেও অনুভূতিশূন্য করে তুলছিলো।

ইবনে তাইমিয়া ছিলেন সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক। পতনোন্মুখ ঐতিহ্য, ফিকহী তাকলীদ, সমাজবিচ্ছিন্ন বিভিন্ন তরিকা ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক শক্তিশালী মৈত্রিতার কারণে জীবদ্দশায় তাঁর সংস্কারচিন্তা সাফল্য ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও তা বৃথা যায়নি। সমকালীন সংস্কার আন্দোলনে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ইবনে তাইমিয়ার তৎপরতা ও পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে – একদিকে উম্মাহর বাস্তবতা ও সংকটের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন এবং অন্যদিকে প্রকৃত উৎসের সাথে এ বাস্তবতার সংযোগ পুনঃস্থাপন, পরবর্তীকালে যুক্ত হওয়া বিচ্যুতিগুলো থেকে তাওহীদী আকীদাকে মুক্ত করা, আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা ও মিশনের প্রতি মানুষের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি এবং ইজতেহাদ ও জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরা।

বর্তমানে কোরআন-হাদীসের আলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলোর ব্যাখ্যা দেখতে দেখতে অনেকে হয়ত এই সমস্ত ইজতিহাদী মূলনীতিকে স্বাভাবিক ধরে নেয়। এ কারণে তারা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া কিংবা পরবর্তীকালের যেসব সংস্কারবাদীরা এই কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইতিহাসের ধ্বংসস্তুপ থেকে বের করে এনেছেন তাঁদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না।

এসব পথপ্রদর্শনমূলক প্রচেষ্টাগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে যেসব তরুণ সচেতন নয়, তাদের জন্যে এটুকু বলাই হয়তো যথেষ্ট হবে – ইজতিহাদ করার অভিযোগে একদল আলেমকে আঠারো শতকের শেষ দিকে দামেস্কে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল! যাইহোক, এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমকালীন সংস্কার আন্দোলনগুলো ইবনে তাইমিয়ার চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বাহ্যিক সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। অথচ ইবনে তাইমিয়া বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সুবিচারের মতো অসাধারণ মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর চিন্তার এই সামাজিক দিকগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কার আন্দোলনগুলোতে অবহেলিত ও প্রান্তিক রয়ে গেছে। আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার, এই মহান আলেমের অনুসারী বলে যারা নিজেদের দাবি করেন, তারা সবাই তাঁর চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করেন এমনটা মনে করার কারণ নেই।

> তিনি নুসুসের সহায়তা ছাড়াই রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে ন্যায়বিচারের মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়্যাহ্ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, রাজনৈতিক তত্ত্ব কোরআন-হাদীস দ্বারা নির্দেশিত হওয়া জরুরি নয়। এটি কোরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়াটাই যথেষ্ট। ইবনে তাইমিয়া উম্মাহ্র অনুমোদনের নীতিকে শাসকের বৈধতার একমাত্র ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি ব্যাখ্যা করেন, রাসূলের (সা) ওফাতের পর সংঘটিত আল-সাকীফার চুক্তি কিংবা উমর (রা) কর্তৃক গঠিত ছয় সাহাবীর শুরা কর্তৃক উসমান (রা) এর নিয়োগে অঙ্গীকার বাধ্যতামূলক (বাইয়্যাত) ছিল না বরঞ্চ তা ছিল মনোনয়ন মাত্র। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও একচেটিয়া বাজার রোধকল্পে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের নীতি এবং রাষ্ট্রের সামাজিক ভূমিকা সক্রিয় করার লক্ষ্যে অন্যান্য প্রক্রিয়াও ইবনে তাইমিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

একজন চিন্তাবিদ যে সময়ে বাস করেছেন, যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন এবং যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও বিষয়াদির সম্মুখীন হয়েছেন সেই আলোকে তার লেখা পাঠ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের বাণীর বৈশিষ্ট্য। ইসলামের এই চিরন্তন বৈশিষ্ট্যই নতুন পরিস্থিতির আলোকে কোরআন-হাদীসের পুনর্ব্যাখ্যাকারী সংস্কারকদের আবির্ভাবকে অপরিহার্য করে তোলে। সপ্তম ও অষ্টম শতকের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল অনেকটা নিম্নরূপ:

সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়ে চার মাজহাবের প্রবল তাকলীদ বিদ্যমান ছিল। পূর্ববর্তীদের কাজের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ তৈরি করার মধ্যেই মূলত তৎকালীন ফকীহদের তৎপরতা সীমিত ছিল। এছাড়া ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ মাজহাব থেকে স্বীয় মাজহাবকে রক্ষা করায়ও তারা ব্যস্ত থাকতেন। যখন কোনো শাসক নির্দিষ্ট একটি মাজহাব গ্রহণ কিংবা নির্দিষ্ট কোনো মাজহাবের আলেমদের প্রশ্রয় দিতেন, তখন মাজহাবগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব আরো বেড়ে যেত। ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী ঐতিহ্যে বেড়ে উঠেছিলেন

এবং ইমাম আহমদের প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তথাপি তিনি ছিলেন একজন স্বাধীন চিন্তাবিদ, যিনি কেবল কোরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ বর্ণনা এবং সাহাবী ও তাঁদের উত্তরসূরীদের উদাহরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন। এর ফলে তিনি এমন ইজতিহাদ ও মতামত দিয়েছেন যা শুধু তাঁর নিজের মাজহাব থেকেই ভিন্ন ছিলো না বরং চার মাজহাব থেকেই ভিন্ন ছিলো। তিনি তাকলীদের সীমানা ভাঙ্গার মাধ্যমে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দেন। এই সাহসের কারণে তাঁকে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁকে তাকলীদপন্থী আলেম ও তাঁদের অনুসারীদের আক্রোশের শিকার হতে হয়।

তারবিয়্যাহ্র ক্ষেত্রে তাসাউফের প্রভাব ছিল প্রবল। কিন্তু ততদিনে তাসাউফের অংশবিশেষ ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ (অদ্বৈতবাদ), ‘হুলুল’ (অবতারবাদ) এবং ‘জাবরিয়া’ (অদৃষ্টবাদ) আকীদাগুলো দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইবনে তাইমিয়া এইসব আকীদা, হালাল-হারামের প্রতি অবহেলা এবং স্বৈরাচারী শাসক ও দখলদারদের জোটবদ্ধতার বিরোধিতা করেন। বৈরাগ্যবাদসহ যে সমস্ত বিদআত তাসাউফের ভেতর অনুপ্রবেশ করেছিল তিনি সেগুলোর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, দারিদ্র্য ও দুর্বলতাকে মহিমান্বিত করা ইসলামবিরুদ্ধ এইসব আকীদা খ্রিষ্টধর্ম (যে ধর্ম নিজেই গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত) থেকে আমদানি করা হয়েছে। বিভিন্ন মাজহাব ও তাসাউফের মধ্যে বিভাজন সমাজকে আরো বেশি বিভক্ত করে। বিশেষ করে, কারো কারো প্রতি রাষ্ট্রের সমর্থনের ফলে ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে আসীন যাজকতন্ত্রের মতোই একটি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এই বিচ্যুতিগুলো ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে ইসলামকে একটি আচারসর্বস্ব অদৃষ্টবাদী বৈরাগ্যবাদে পরিণত করে।

তাসাউফের প্রতি তাঁর তীব্র সমালোচনার ফলে এর প্রতি তাঁর বিরোধিতা সম্পর্কে সৃষ্ট ধারণা সত্ত্বেও বলা চলে তিনি তাসাউফের ব্যাপারে তাঁর মতামতগুলো সরলীকরণ করেননি। বরং তিনি তাসাউফের বিশুদ্ধ ও বিচ্যুত ধারার মধ্যে পার্থক্য করেছেন মাত্র। তিনি প্রায়ই আল জোনাইদ ও আল কায়লানীর মতো তাসাউফের প্রথম দিককার শায়েখদের প্রশংসা করতেন। আর আল হাল্লাজ, ইবনে ‘আরাবী, ইবনে সাবঈন, আন নাকাবী ও অন্যান্যদের দার্শনিক মরমিবাদের সমালোচনা করতেন। তিনি সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক আচারসমূহের সমালোচনা করতেন। তাতার, ক্রুসেডার ও স্বৈরাচারী শাসকদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার বিরোধিতা করেছেন। হাম্বলী সুফী আব্দুল কাদির জিলানীর নামানুসারে গড়ে ওঠা কাদেরিয়া সুফী তরীকার সাথে ইবনে তাইমিয়া সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন। এমনকি আব্দুল কাদির জিলানীর রচিত “ফুতুহ্ আল-গায়েব” বইয়ের অংশবিশেষের ব্যাখ্যা হিসেবে ইবনে তাইমিয়া “শরহে ফুতুহ্ আল-গায়েব” নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

এভাবে তৎকালীন পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ ইবনে তাইমিয়ার কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে যেমন জড়িয়ে আছে, তেমনি তাঁর কাজকে প্রভাবিতও করেছে। তাঁর লেখালেখিগুলো তাঁর গভীর জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি তাঁর লেখালেখিতে তৎকালীন সংস্কৃতিকে বুঝা ও একে শরয়ী মানদণ্ডে বিচার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ওহী (মানকুল) ও যুক্তিবোধ (মা’কুল) উভয়কেই তিনি শরয়ী মানদণ্ডের অংশ মনে করতেন। আল্লাহ, রাসূল (সা) ও সালফে সালেহীনদের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং তীক্ষ্ণ মননের সমন্বয়ে তিনি এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেন।

> ইবনে তাইমিয়া মনে করতেন, উম্মাহ্ তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। তিনিসহ অন্যান্য সংস্কারকগণ উম্মাহ্র পতন, পশ্চাৎপদতা ও অন্য জাতির অধীনস্ত হওয়ার প্রকৃত কারণ হিসেবে উম্মাহ্ ও ইসলামের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্বকে চিহ্নিত করেন। ইমাম মালিকের বক্তব্যের মূলনীতির আলোকে তিনি একটি সামগ্রিক সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু করেন। ইমাম মালিক বলেছিলেন: “এই উম্মাহ্র পরবর্তী প্রজন্মগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করবে, যা প্রথম প্রজন্মকে সফল করেছিল।”

ইবনে তাইমিয়া সালাফদের অনুসৃত পদ্ধতির আলোকে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। এ পদ্ধতি শরীয়াহকে মনন দ্বারা বিচারের স্থলে শরীয়াহ্ দ্বারাই বিচারের নীতি ধারণ করতো, এই অনুমানের ভিত্তিতে যে এই দুয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো ধরণের সংঘাত নেই। তিনি আলেমদের কঠোরতা অবলম্বনের নীতিরও বিরোধিতা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ইজতিহাদের ডাক দেন এবং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো কোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে বিবেচনা করার আহবান জানান। সালাফদের আকীদার দিকে আহবানের মাধ্যমে তিনি ‘হুলুল’ ও ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ আকীদার বিরোধিতা করেন। তাকওয়া ও জিহাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নবুয়তী তারবিয়্যাহ্র দিকে আহবানের মাধ্যমে ভ্রান্ত আকীদাগুলোর তারবিয়্যাহ্ ও সুলুকের বিরোধিতা করেন। তিনি শাসকদের স্বৈরাচারিতা এবং সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্বের প্রতি অবহেলার বিরোধিতা করেন। তিনি এমন একটি সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন যা শাসক ও শাসিতের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দরিদ্রদের সুরক্ষা প্রদান, বণ্টন ও মূল্য নির্ধারণে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাসহ জনগণের স্বার্থ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে। ‘আল-

হিসবা’ বইয়ে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।

উপরোক্ত বক্তব্য সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া বিভক্তির দিকে ডাকেননি। তিনি শাসক, আলেম ও জনগণসহ সমস্ত উম্মাহকে পুনর্জাগরিত ও পুনুরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি কেবল বক্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বাস্তবেও অনেক কিছু করেছেন। তিনি প্রায়ই জনগণের অভিযোগ ও দাবি নিয়ে সরাসরি শাসকদের কাছে চলে যেতেন। তিনি দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছেন। এমনকি যুদ্ধবন্দীদের সংকট নিরসনে রাজনৈতিকভাবে ভূমিকা রেখেছেন।

তাঁর মতো মহান সংস্কারককে বুঝতে হলে তৎকালীন বাহ্যিক সামরিক ও সভ্যতার চ্যালেঞ্জসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ সংকটগুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। এই বহুবিধ সংকট উম্মাহকে একটি আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিল। এর ফলে পারস্পরিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের পরিবর্তে উম্মাহ্ নিজস্ব স্বতন্ত্র চরিত্রের সন্ধানে অধিক জোর দিয়েছিল। এই জায়গা থেকে দেখলে এটি স্পষ্ট হয়, ইবনে তাইমিয়ার কর্মপ্রচেষ্টা ছিল তাঁর সময়ের চ্যালেঞ্জ ও অগ্রাধিকারের ব্যাপারে একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া।

যাইহোক, তিনি এমন একটি সময়ে কাজ শুরু করেছিলেন যখন উম্মাহ গভীর পতনের সম্মুখীন। ফলে তাঁর আহবান তাদের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। তাঁর আহবানকে বিবেচনায় নেয়ার পরিবর্তে উম্মাহ্র নেতৃবৃন্দ একে স্তব্ধ করে দিতে উঠেপড়ে লাগে। তিনি একের পর এক বিচারের সম্মুখীন হন। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি ইবনে তাইমিয়াকে নয়, বরং যে রেনেসাঁর আহ্বান তিনি জানাচ্ছিলেন তাকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল। এবং এর বিচারক কোনো মালিকী অথবা শাফিয়ী আলেম ছিলেন না বরং এর বিচারক ছিল তৎকালীন যুগের পতনাবস্থা। শাফেয়ী মাজহাবভুক্ত তাঁর শিষ্য আল-বিরজালী, আয-যাহাবী, ইবনে কাসীর এবং হাম্বলী মাজহাবভুক্ত জীবনীকার ইবনে রজব ইবনে তাইমিয়ার জীবনের এই কঠিন পরীক্ষাগুলো নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তবে তাঁর নিজের মতে, বন্দীজীবন ছিল তাঁর জন্যে রহমতস্বরূপ, যা ইলমের সাথে আমলের সম্মান এবং ইজতিহাদের সাথে জিহাদের মুকুটে তাঁকে সজ্জিত করেছে।

> জীবনীকারগণ ইবনে তাইমিয়ার বন্দীজীবনের বেশ কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যা তাঁর ঐ সময়ের মানসিক অবস্থার পরিচয় দেয়। যেমন: “আমার শত্রুরা আমার কিই-বা করতে পারে? আমার জান্নাত তো আমার অন্তরে, আমি যেখানেই যাই তা আমার সাথেই থাকে; একে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কারাগার হলো আমার জন্য নির্জন আশ্রয়; মৃত্যুদণ্ড হলো শাহাদাতের সুযোগ এবং নির্বাসন হলো ভ্রমণের সুযোগ।”

ইবনে তাইমিয়ার মৃত্যুর তিন মাস আগে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আল-ইখনা’য়ী সুলতানের কাছে নালিশ করেন। এই ব্যক্তির যুক্তি খণ্ডন করে একবার ইবনে তাইমিয়া একটি লেখা লিখেছিলেন। আল-ইখনা’য়ীর নালিশের প্রেক্ষিতে ইবনে তাইমিয়াকে কারাগারে লেখালেখি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার আদেশ দেয়া হয়। ফলে তাঁর কাগজ, কালি ও কলম ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ৭২৮ হিজরীর ২০ জিলকদ (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৩২৮) ইবনে তাইমিয়া ৬৫ বছর বয়সে জেলখানায় মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে কাসীরের মতে, ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোক তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণ করেছিল। এর মাঝে ১৫ হাজার ছিলেন নারী।

আল হাফিজ আল মিজ্জী বলেছেন, “আমি তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি, তিনিও তাঁর মতো কাউকে দেখেননি। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাহর ব্যাপারে তাঁর মতো জ্ঞানী ও পাবন্দী আর কাউকে আমি দেখিনি।”

সূত্রঃ Ibn Taymiyyah: Misunderstood Genius

রশীদ আল ঘান্নুশী

তিউনিশিয়ার প্রধান ইসলামী দল আন-নাহদা এর প্রতিষ্ঠাতা ও এর বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা